দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 07 MAY 1992
পৃষ্ঠা 1 কলাম

অনির্বাণ

সত্যসন্ধ

শিক্ষক না-কি মানুষের দ্বিতীয় পিতা। সন্তানের জনক-জননী সন্তানের জন্ম দেন বটে, কিন্তু তাকে 'মানুষ' করে 'নবজন্ম' দানের গৌরব অবশ্যই শিক্ষকের। শিক্ষাঙ্গনকে যে মানুষ গড়ার কারখানা এবং শিক্ষকদের মানুষ গড়ার কারিগর বলা হয় তা এই সুবাদেই। আজকাল মানুষ গড়ার এই মহান কারখানার হাল-হকিকত যে খুব একটা সুবিধের নয় সে বিষয়ে, আশা করি, দেশের প্রায় সবাই একমত। মানুষ গড়ার এই কারখানা, যাকে আমরা শিক্ষাঙ্গন বলে জানি, তার ব্যাপারে এখন মানুষের সীমাহীন অভিযোগ। সেশন জট থেকে শুরু করে অনেক ব্যাপারেই মানুষ এখন প্রতিবাদ মুখর। শিক্ষাঙ্গনে একাডেমিক পরিবেশের এখন নিদারুণ অভাব। শিক্ষাঙ্গনে নিত্য-দিন এখন চলে রাজনৈতিক দলাদলি, দ্বন্দ্ব-সংঘাত। শিক্ষার্থীদের অনেকের হাতেই এখন বই-পত্তরের বদলে শোভা পায় মারণাস্ত্র। শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস যেন এখন স্থায়ী ঠিকানা করে নিয়েছে। যার ফলে অনেকেই এখন শিক্ষাঙ্গনকে নতুন নাম দিতে চান রণাঙ্গন।

কিন্তু কেন? পৃথিবীর অন্যতম দরিদ্র রাষ্ট্র বাংলাদেশের গরীব পিতা-মাতা গার্জিয়ানরা তো তাদের সন্তানদের মানুষ করার স্বপ্ন নিয়েই তাদের অনেক কষ্টের টাকা-পয়সা খরচ করে শিক্ষাঙ্গনে পাঠান শিক্ষা লাভের জন্য। শিক্ষিত হয়ে, মানুষের মত মানুষ হয়ে পিতা-মাতা এবং সমাজের মুখ উজ্জ্বল করার লক্ষ্যে। তারা তাদের জীবনের শেষ সম্বল ব্যয়েউচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য সন্তানদের শিক্ষাঙ্গনে পাঠান মানুষ হবার জন্য; সন্ত্রাসী হবার জন্য নয়, 'লাশ' হয়ে ফিরার লক্ষ্যেও নয়। কিন্তু তবুও তাদের এ নিরীহ স্বপ্ন ভেঙে চুরমার হয়ে যায় কেন? এর জন্য কে বা কারা দায়ী?

আমরা জানি, আমাদের দেশের অগণিত মানুষের শিক্ষাঙ্গন নিয়ে এ স্বপ্ন ভংগের জন্য কোন একক কাউকে দায়ী করা যায় না। আমরা যে সমাজে, যে সমাজ ব্যবস্থায় বাস করি, তার ভাল-মন্দ কোন প্রভাবকেই আমরা একেবারে অস্বীকার করতে পারি না। এমনকি যে গার্জিয়ান মহল শিক্ষাঙ্গনকেই ঢালাওভাবে সন্তান-সন্ততি বখে যাবার জন্য দায়ী করতে চান, তাদেরও স্বীকার করতে হবে, যে কোন ছেলে-মেয়ের মানসিক ও নৈতিক গঠনে ও বিকাশে তাদের নিজ নিজ পারিবারিক ও সমাজ পরিবেশের প্রভাবকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই। তাছাড়া দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডল এবং রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ বহু দিন ধরেই শিক্ষাঙ্গনকে প্রভাবিত করার ব্যাপারে মোটেই কম যান না। অথচ এই পরিবার, এই সমাজ বা এই রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের নেতৃবৃন্দ কেউই শিক্ষাঙ্গনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নন, অন্ততঃ থাকার কথা না। শিক্ষাঙ্গনকে যদি মানুষ গড়ার কারখানা এবং শিক্ষকদের যদি মানুষ গড়ার কারিগর বলা যায়, তবে শিক্ষার্থীদের অবশ্যই এই মানুষ গড়ার কারখানার কাঁচামাল বা র' ম্যাটেরিয়ালস বলতে হয়। আর এই কারখানার আসল দায়-দায়িত্ব কিন্তু যারা এই মানুষ গড়ার কারখানার কারিগর তাদেরই, অর্থাৎ শিক্ষকদেরই।

মানুষ গড়ার কারখানায় মানুষ তৈরীর বদলে যদি সন্ত্রাসী বা লাশ তৈরী হয় তার জন্য বাইরের অন্য যার যত কুপ্রভাবই থাকুক না কেন, তার প্রত্যক্ষ ও প্রাথমিক দায়-দায়িত্ব শিক্ষকরা কিছুতেই এড়াতে পারেন না। শিক্ষাঙ্গনে বাইরের সমাজের বা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের কুপ্রভাব তারা যদি প্রতিহত করতে না পারেন, তাহলে তারা এ কুপ্রভাব এড়াতে ও প্রতিহত করতে আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন, অন্ততঃ এ প্রমাণ তাদের রাখতে হবে। নইলে শিক্ষাঙ্গনের রণাঙ্গণে পরিণত হওয়ার দায়-দায়িত্ব তারা এড়াতে পারেন না।

সমাজ চিরটাকাল ভাল-মন্দ তার নিজস্ব গতিতেই চলে। আর এ সমাজেরই অবিচ্ছেদ্য অংশ পরিবার, পরাধীন যুগেও আমাদের সমাজ ও আমাদের পরিবার, খুব সুস্থ অবস্থায় ছিল এমন দাবী করা যায় না। দাবী করার কথাও না। কিন্তু তখনও এদেশে এমন সব শিক্ষক ছিলেন যাদের কথা স্মরণ করতেও অলক্ষ্যে আমাদের মাথা নত হয়ে আসে। মাথার উপর বিদেশী শাসকদের উদ্ধত শাসনদণ্ড, চারদিকে অজ্ঞতা, কুসংস্কার আর দারিদ্র্যের কুয়াশাচ্ছন্ন প্রতিকূল পরিবেশ তার মধ্যেও আমরা এমন সব শিক্ষকের ইতিহাস জানি যারা শুধু মাত্র তাঁদের আদর্শ ব্যক্তিত্ব বা সুউচ্চ চরিত্র গুণে, গোটা শিক্ষাঙ্গনের একটা মহৎ পবিত্র চারিত্র বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছেন। পরাধীনতার সেই অভিশপ্ত পরিবেশে সেই মহান শিক্ষকদের মনে স্বাধীনতার আগুন ধিকি ধিকি করে জ্বলত না, এমন নয়। তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল না, বা তাঁদের একের সঙ্গে অন্যের পারস্পরিক রাজনৈতিক মতপার্থক্য ছিল না, এমনও নয়। তবুও কী করে তারা শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা বজায় রাখতে পারতেন তা কি আমরা একবার গভীরভাবে ভেবে দেখেছি? মনে হয়, সে রকম চিন্তার কথা মাথায় আনাও আমরা অনেকে অপ্রয়োজনীয় মনে করি।

রাজনীতির কথা আসাতে প্রশ্ন উঠতে পারে— শিক্ষাঙ্গনের বর্তমান করুণ অবস্থা সৃষ্টির পেছনে শিক্ষকদের কোন দায়-দায়িত্ব নেই, এজন্য দায়ী দেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক শক্তি, তথা বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ। একথাও বলা যায়, রাজনৈতিক দলসমূহের কারণেই আজ শিক্ষার পরিবেশ কলুষিত, শিক্ষাঙ্গন রাজনৈতিক দাবাকোটে পরিণত, পরিণত রণাঙ্গনে। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনের মূল কারিগর শিক্ষক সম্প্রদায়ের সবাই কি বুকে হাত দিয়ে বলতে পারেন, তাঁরা অন্ততঃ তাঁদের সক্রিয়তম অংশটি বাইরের এই সব রাজনৈতিক শক্তির হাতের ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহৃত হতে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন না?

অতীতের কথা আমরা বলতে পারি— শিক্ষকদের মধ্যেও রাজনৈতিক বিশ্বাস ছিল, এমনকি ছিল রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে পারস্পরিক মতপার্থক্য, কিন্তু তাদের সে রাজনৈতিক বিশ্বাস কিংবা রাজনৈতিক মতপার্থক্য কোনদিন ক্লাসে বা ছাত্রদের সঙ্গে তাদের আচরণের ক্ষেত্রে কখনও প্রকাশ পেত না।

ফলে যার যার রাজনৈতিক বিশ্বাস নিয়ে তারা থাকতেন। ক্লাসে এবং ছাত্রদের সঙ্গে বিভিন্ন আচার-আচরণে তারা ছিলেন শিক্ষক, শুধুই শিক্ষক এবং শিক্ষক ছাড়া কিছুই না। ফলে শিক্ষার্থীরাও শিক্ষকদের তাঁদের রাজনৈতিক বিশ্বাসের উর্ধ্বে ভিন্ন নজরে দেখত এবং শিক্ষকরা পেতেন ছাত্রদের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা, ভক্তি ও আনুগত্য।

কিন্তু এখন? ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এক অধ্যাপকের কথা জানি। তিনি ক্লাস নিতে যেয়ে কোন বিষয়ে পাঠদানের পর বলতেন, এতক্ষণ যা পড়ালাম, এটা পাঠ্যসূচীর কথা, কিন্তু এটা লিখলে পরীক্ষার খাতায় নম্বর দেব না, আমার পেপারে নম্বর পেতে হলে অমুক অমুক লাইনে উত্তর দিতে হবে। এমন বহু শিক্ষকের খবর আমাদের জানা আছে, যারা তাদের সমর্থিত বিশেষ রাজনৈতিক দল না করলে তাঁর ক্লাসের ছাত্রদের কোন প্রাপ্য সুযোগ দিতেও রাজি না। বিশ্ববিদ্যালয়ে উনিশশ' বাহাত্তরের দিকে এক নাগাড়ে রাজনৈতিক বিবেচনায় কয়েকশ' শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে এই প্রবণতা আরও বৃদ্ধি পায়। এখন শুধু বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, বহু কলেজেও এবং হয়ত কোন কোন স্কুলেও শিক্ষকদের একাংশের রাজনৈতিক লাইন অনুসরণ না করে কোন শিক্ষার্থী তার প্রাপ্য সুযোগ-সুবিধাও পেতে পারে না। শিক্ষকরা নিজেরাই যদি এভাবে দলীয় রাজনীতিকে শিক্ষাঙ্গনে টেনে আনেন তাহলে, সরলমতি তরুণ ছাত্ররা যে আরেক হাত অগ্রসর হয়ে বিশেষ রাজনৈতিক লাইনের জয়ের জন্য রাজনৈতিক দলাদলি, সংঘাত ও সন্ত্রাসে মেতে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য কি!

সুতরাং শিক্ষাঙ্গনকে ছাত্ররা সন্ত্রাসের আখরা বা রণাঙ্গনে পরিণত করেছে, বা আজকের তরুণ ছাত্র সমাজ বখে গেছে, এ ধরনের ঢালাও অভিযোগ আনার আগে আমরা যদি শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ দূষিতকরণে একশ্রেণীর শিক্ষকদের ভূমিকা পর্যালোচনা করি, তাহলে কিন্তু দেখতে পাব, যারা বই-পুস্তকের বদলে মারণাস্ত্র হাতে আজ একে অপরের সঙ্গে আত্মঘাতী হানাহানিতে মত্ত হয়েছে, তাদের ঐ হাতগুলোতে বইয়ের বদলে অস্ত্র উঠবার পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত একশ্রেণীর শিক্ষকের অবদান বা শুভেচ্ছাও কম নেই।

সুতরাং তরুণ শিক্ষার্থীদের আমরা শিক্ষাঙ্গনকে রণাঙ্গনে পরিণত করার ব্যাপারে যতটা দোষী সাব্যস্ত করি, ততটা অপরাধী বোধ হয় তারা নয়। আমরা বলি না, শিক্ষকদের সকলেই দলীয় রাজনীতির ব্যাপারে সমান উৎসাহী। বরং একথাই বাস্তব সত্য যে, শিক্ষকদের বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তাদের শত সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও রাজনীতি বা দলীয় রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাতে উৎসাহী নন। তাদের একটি ক্ষুদ্র সক্রিয় অংশই শিক্ষাঙ্গনের পরিবেশ বিনষ্টিতে অধিক উৎসাহী।

কিন্তু যেহেতু নীরব সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ শিক্ষাঙ্গনের পবিত্রতা সংরক্ষণে এগিয়ে আসেন না, তাই দায়-দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত বর্তায় সবার উপরেই। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাইস চ্যান্সেলর থেকে শুরু করে বহুতর প্রশাসনিক পদে নিয়োগ শিক্ষকদের ভোটের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ায় এই ধরনের দলীয় রাজনীতির প্রভাব শিক্ষাঙ্গনে পাকাপোক্ত হয়ে আসন গেড়ে বসেছে। আমরা জানি না, আমাদের দেশের শিক্ষাঙ্গন থেকে দলীয় রাজনীতির এই কুপ্রভাব কবে কাটবে এবং আদৌ কখনও কাটবে কি না।